গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩ জানুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে সরকার হাইকোর্ট দেখাচ্ছে

সর্বস্তরের গ্রাহকদের উপর অভিন্ন বিদ্যুৎ মাশুল চালু করার নামে ক্ষুদ্রগ্রাহকদের উপর বিপুল বাড়তি মাশুল চাপানো ও শিল্পপতিদের জন্য বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর যে ঘোষণা বিদ্যুৎ কমিশন করেছে, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জী তার বিরুদ্ধে জানুয়ারি মাসে হাইকোর্টে যাবেন বলেছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপব্যাখ্যা করে কমিশন যে রায় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের কোন এক্তিয়ারই নেই। কাজেই হাইকোর্টে গিয়ে লোক ঠকানো ছাড়া তাদের আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে !

অথচ এর কোন প্রয়োজন ছিল না। **ইচ্ছে করলে রাজ্য সরকার আগেই মাশুলবৃদ্ধি রুখতে পারত।** এ ব্যাপারে যে সময়ে হাইকোর্টে যে মামলা হয়েছিল সরকার তাতে অংশগ্রহণ না করে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়াবার রাস্তাই করে দিয়েছিল। যদি **সত্যিই তাঁরা গরিব মানুষের উপর বাড়তি মাশুল চাপাতে না চাইতেন তবে বিদ্যুৎ আইন ১৯৯৮-এর ৩৯ ধারায় কমিশনের সুপারিশ খারিজ করতেন।** আইনগত এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সি পি এম ফ্রন্ট সরকার সেই আইন প্রয়োগ করেনি। এখনও এই মুহূর্তেই চাইলে তারা মাশুলবৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ করতে পারে। কিন্তু তা তারা করছে না। তাহলে তারা মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাচ্ছে কেন? কী তাদের লক্ষ্য? তাদের লক্ষ্য বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি রোখা নয়, তারা চায় জনরোষে জল ঢালতে। মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও বোকা বানানোর জন্যই তারা হাইকোর্টে যাবার ধুয়ো তুলেছে। বিদ্যুৎ মাশুল কী ভয়ঙ্করভাবে বাড়ানো হয়েছে তা তালিকা থেকেই স্পষ্ট হবে। *(মাশুলবৃদ্ধির তালিকা ৮ পাতায়)*

বর্ধিত কোর্ট ফি-র বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক কর্মবিরতি আন্দোলন

এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী অভিনন্দন

(বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের প্রতি এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ অভিনন্দন জানিয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছেন, তা এখানে প্রকাশ করা হল।)

আপনারা রাজ্য সরকারের কোর্ট ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘ দেড়মাস ধরে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন। '৪৭ সালের পর জনগণের স্বার্থে এ রাজ্যের আইনজীবী, মোক্তার, করণিক ও কোর্টের কর্মচারীরা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন এই প্রথম করলেন। সকল অপপ্রচার, হুমকি, সরকারি দলের লেজুড় সংগঠনের আন্দোলন ভাঙার অপচেষ্টা, ক্রিমিনালদের হামলা, পুলিশি আক্রমণ সব কিছু উপেক্ষা করে এবং ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে আপনারা যে অদম্য দৃঢ়তা, সাহস, তেজ ও সংগ্রামী মানসিকতা নিয়ে কর্মবিরতির আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, তার জন্য সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ব্যাপক জনগণ কী প্রবল সহানুভূতি নিয়ে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। আদালত বন্ধ, অনেকেরই স্বামী-পুত্র-আত্মীয়-আত্মীয়া জেলে, ট্রায়াল হচ্ছে না, জামিন হচ্ছে না, গুরুত্বপূর্ণ মামলা আটকে আছে, কারাগারে বন্দীদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে, — এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সি পি এম সরকার অনেক চেষ্টা করেছে জনগণকে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে, কিন্তু পারে নি। জনগণ গভীর আবেগের সাথে এই আন্দোলনকে নিজেদের লড়াই মনে করে সকল অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধতা, এতটুকু বিরূপতা ব্যক্ত করেননি। এটা কম কথা নয়। এর কারণ, গরিব জনগণ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, এর আগেই আদালতের ব্যয় বহন করা কত দুঃসাধ্য ছিল, যার জন্য অতি দুঃখে অনেকেই বলেন, 'যার টাকা আছে তার জন্যই আইন-আদালত আছে।' ফলে প্রচলিত আইনে যতটুকু বিচারের সীমাবদ্ধ সুযোগ আছে, অধিকাংশ উৎপীড়িত-নিপীড়ত মানুষ তার থেকেই বঞ্চিত থাকে, বিচার কেনার ক্ষমতা না থাকায়। এই অবস্থায় এবারকার বর্ধিত কোর্ট ফি তাঁদের জন্য আদালতের সঙ্কীর্ণ দ্বার একেবারেই রুদ্ধ করে দেবে। তাই তাঁরা এই আন্দোলনকে নিজেদের লড়াই বলে গণ্য করেছেন। আপনাদের লড়াইকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। সরকারের সকল ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করে এত দীর্ঘদিন এভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, জনগণের এত ব্যাপক সমর্থন পাওয়া, এই সাফল্যের মূল্যও কম নয়। সেটা আপনাদের এবং আমাদের সকলের কাছেই প্রেরণাদায়ক ও শিক্ষণীয়।

সাধারণত দেখা যায়, উপরের নেতৃত্ব আন্দোলনের ডাক দেয়, প্রস্তুতি করে, তারপর নিচু তলার সাধারণেরা আন্দোলনে নামে। কিন্তু আপনাদের এই আন্দোলন আরেকটা প্রশংসনীয় ও

চারের পাতায় দেখুন

জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার দাবিতে

মৎস্যজীবীদের আমরণ অনশন

একমাস আগে, গত নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের কোনও আগাম সতর্কবার্তা না পেয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া গরিব মৎস্যজীবীদের মর্মান্তিক পরিণতির করুণ কাহিনী অনেকেরই হয়তো মনে আছে। কিন্তু এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও, নিত্য যে দুর্ভোগ এদের সহ্য করতে হয়, জীবিকার উপর আক্রমণ তো বটেই, এমনকি জীবনও বিপন্ন করে এদের সমুদ্রে যেতে হয়, সে খবর বাইরের মানুষ জানেন না বললেই চলে।

বঙ্গোপসাগরে ভারত-বাংলাদেশ জলসীমানায় ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থান প্রায় উন্মুক্ত। নিয়ম অনুযায়ী এখানে দু-দেশের নিজস্ব জলসীমানার মধ্যে দু'দেশের রক্ষীবাহিনী থাকার কথা, যারা দেখবে যাতে এক দেশের মৎস্যজীবীরা অন্য দেশের জলসীমানায় না ঢুকে পড়ে এবং সীমানা দিয়ে অন্যান্য ধরনের অপকর্ম না ঘটে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে ভারত সরকারের কোন সক্রিয়তাই নেই। চন্দ্রমুখী খাল থেকে হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার জলসীমানায় কোন পাহারার ব্যবস্থাই সরকার করেনি। ফলে সীমান্তবর্তী অন্যান্য দেশ, বিশেষত বাংলাদেশ থেকে জলদস্যু ও মৎস্যশিকারীরা তো বটেই, এমনকি বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিডিআর-এর সেপাইরা পর্যন্ত ভারতীয় জলসীমানায় কেঁদোদ্বীপের নিকটবর্তী ২০-২৫ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে যেমন ইচ্ছা মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উপর হামলা, ট্রলার ছিনতাই ইত্যাদি যাবতীয় দুষ্কর্মই করে থাকে। এই নিত্য হামলা ও হয়রানির সামনে গরিব নিরস্ত্র মৎস্যজীবীরা সম্পূর্ণ অসহায়। বারবার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ১৩৩টি ট্রলার বাংলাদেশী জলদস্যুরা ওদেশে টেনে নিয়ে গেছে। বহু চেষ্টায় ২৫টি ট্রলার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মৎস্যজীবীরা ফিরে এলেও বাকী ট্রলারগুলি এখনও পাওয়া যায়নি। এই অপরাধ চক্রের সাথে ভারতীয় জলদস্যু ও কিছু অসৎ ব্যবসায়ীও যুক্ত আছে। যাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থাও সরকার করেনি। সমগ্র পরিস্থিতি ক্রমেই এমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে যাওয়াই, অর্থাৎ জীবিকাই বন্ধ হওয়ার মুখে।

দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবীদের সংগ্রামী সংগঠন ওয়েস্ট-বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারমেন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে মৎস্যজীবীরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিকার দাবি করে আসছে। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভাতেও এই সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে সরকারকে উপযুক্ত

সাতের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, হাসপাতালের চার্জ ও শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, কোর্ট ফি ও ব্যাপক কর বৃদ্ধি, নির্বিচার শ্রমিক ছাঁটাই কৃষিনীতি, ফসলের দাম না পাওয়ার প্রতিবাদে, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

২৭ জানুয়ারি

বাংলা বনধ

সফল করুন

বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বিদ্যুৎ আইন ১৯৯৮-এর ৩৯ ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের সিদ্ধান্ত খারিজ করার দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। পূর্বাহ্নে জানান সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বা কোন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্মারকলিপি গ্রহণ না করায় বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা লেনিন সরণী ও চৌরঙ্গির মোড় অবরোধ করেন।

হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে দীর্ঘ ৫৫ মিনিট অবরোধ চলার পর একজন ডি সি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ করে ১১ জনকে আহত ও ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। আগামী ২০ জানুয়ারি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণায় ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্ধিত চার্জ, বর্ধিত কোর্ট ফি ও বাসের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে, রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত নয়া কৃষিনীতি বাতিল এবং আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে গত ২৪ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির আহ্বানে বারাসতে জেলাশাসক দপ্তরে সহস্রাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জেলার প্রায় ২০ হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র নিয়ে এস ইউ সি আই-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহম্মদ হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। এরপর এক সুসজ্জিত মিছিল বারাসত কলোনি মোড়ে পৌঁছালে সেখানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনুকূল ভদ্র। উপরোক্ত দাবিতে ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ ও জেলার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড অমল সেন।

রানাঘাট ও মথুরাপুরে অসংগঠিত শ্রমজীবী রেলযাত্রীদের কনভেনশন

গত ৭ ডিসেম্বর রাণাঘাট নাসড়া হাইস্কুলে পাঁচ শতাধিক গরিব অসংগঠিত শ্রমজীবী রেলযাত্রীদের উপস্থিতিতে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ টাকার মান্থলি টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে রেল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক জটিলতা দূর করার দাবি জানিয়ে কনভেনশনের মূল প্রস্তাব রাখেন প্রবীর দে। প্রস্তাবে ১৫০০ টাকার নীচে মাসিক আয়ের সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের এই টিকিট পাওয়ার সুযোগ, নিয়মিত

মথুরাপুরে পরিচারিকাদের কনভেনশন

রেলচলাচল, যাত্রীনিরাপত্তা, রেলের সম্প্রসারণ ও অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, সন্তানদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটির দাবিও করা হয়।

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সম্পাদিকা পুষ্প পাল ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন শিয়ালদহ মেইন শাখার প্যাসেনজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বপন চৌধুরী, সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সদস্যা প্রতিমা শাসমল, নদীয়া জেলা অসংগঠিত শ্রমজীবী রেলযাত্রী সমিতির বিজয় বাইন, প্রভাত ঘোষ, সুনি পাল প্রমুখ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কুপার্স নাগরিক সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক অরুণ বাড়ই। ঊষা সাহাকে সভানেত্রী ও প্রবীর দে-কে সম্পাদক করে ২৪ জনের নদীয়া জেলা কমিটি গঠিত হয়।

২৫ টাকার মাসিক টিকিট, বেতনবৃদ্ধি, সবেতন ছুটি, সন্তানদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি দাবিতে ১৫ ডিসেম্বর মথুরাপুর আর্য বিদ্যাপীঠে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির মথুরাপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক পরিচারিকা আবেগ ও উৎসাহ সহকারে অনুষ্ঠানে জমায়েত হন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক ও সমাজসেবী পৃথ্বীশ কর। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মৌসুমী মণ্ডল। পরিচারিকা সমিতির শুভানুধ্যায়ী ও নানা আন্দোলনের সাথী অরুণা কর অসুস্থ অবস্থায় এক মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন লিখে পাঠান। ঐ প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা পুষ্প পাল। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অসীমা কর। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অম্বিকা বিশ্বাস, আরতি ভট্টাচার্য, চন্দ্রাণী ভাণ্ডারি, কবিতা হালদার, মন্দাকিনী তাঁতি, জ্যোৎস্না হালদার, বুলা পাইক, মেনকা হালদার, শীলা ময়রা। নারী নির্যাতন ও সমাজে সার্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মীরা কর। কনভেনশনে মীরা করকে সভানেত্রী, অসীমা কর ও অম্বিকা বিশ্বাসকে যুগ্ম-সম্পাদিকা করে মোট ২১ জনকে নিয়ে পরিচারিকা সমিতির মথুরাপুর আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক

কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যকে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর বিরুদ্ধে

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ

গত অক্টোবর মাসে রিষড়ার হেস্টিংস জুট মিলের লেবার অফিসার দুঃখজনকভাবে খুন হন। এই ঘটনার পরই মালিকগোষ্ঠী বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যকে মিথ্যামামলায় জড়িয়ে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েই ৭ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন।

"রিষড়ার হেষ্টিংস জুট মিলের লেবার অফিসার খুনের সাম্প্রতিক ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। কিন্তু এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর রাজ্য সহ-সম্পাদক এবং বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্যকে মিথ্যামামলায় জড়ানোর যে জঘন্য অপচেষ্টা হেষ্টিংস জুট মিলের কর্তৃপক্ষ এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা চালাচ্ছে, তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এটি একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। আমরা এই চক্রান্তের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছি।"

চিত্তব্রত মজুমদার - সি আই টি ইউ, সুব্রত মুখোপাধ্যায় - আই এন টি ইউ সি, শঙ্কর সাহা - ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, অশোক ঘোষ - ইউ টি ইউ সি, অতনু চক্রবর্তী - এ আই সি সি টি ইউ, রণজিৎ গুহ - এ আই টি ইউ সি, বৈজনাথ রাই - বি এম এস, সুধাংশুশেখর ঘোষ - টি ইউ সি সি, লালতাপ্রসাদ আস্থানা - এইচ এম এস।

সালানপুরে বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ

গত ১৯ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকে বি ডি ও-র নিকট এস ইউ সি আই চিত্তরঞ্জন-রূপনারায়ণপুর লোকাল কমিটি'র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং স্মারকপত্র পেশ করা হয়। প্রতিনিধিরা বি ডি ও'র সঙ্গে দেখা করে বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও হাসপাতালের চার্জ বৃদ্ধি, শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাই ও বেসরকারীকরণ এবং স্থানীয় বেহাল রাস্তা মেরামত, বিদ্যুৎহীন গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ, পিঠাকেয়ারি হাসপাতালে সুচিকিৎসা, এলাকায় সাব-পোস্ট অফিস খোলা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। বি ডি ও স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধানের সাধ্যমত চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবিগুলি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

ডি ওয়াই ও'র কলকাতা জেলা রাজনৈতিক ক্লাস

গত ৮ ডিসেম্বর ডি ওয়াই ও'র কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে বেহালায় বড়িষা জনকল্যাণ হাইস্কুলে সারাদিনব্যাপী এক রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক যুবক-যুবতী এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও যুবজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে প্রতিনিধিরা প্রশ্ন রাখেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'যুব সমাজের প্রতি' বইটির উপরও প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা করেন কমরেড মানিক মুখার্জী। তিনি দেখান যে, বর্তমানে যুবজীবনের সমস্যাগুলির মূল কারণ হল ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপ্লবের আঘাতে ভেঙে ফেলে নতুন আদর্শবোধের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে হবে। আর, সে কাজ করতে হলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে যুবসমাজকে সংগঠিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতেহবে। ডি ওয়াই ও'র কর্মীদেরই এই লক্ষ্য নিয়ে যুবসমাজকে সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে খরাপীড়িত ছাত্রদের ফি মকুবের দাবিতে ৩০ নভেম্বর ডি এস ও'র উদ্যোগে জেলা কালেক্টরেটের সামনে ছাত্রধরণা

বিজেপি সরকার যাকে 'উন্নয়ন' বলছে বাস্তবে তা গভীর সংকটেরই চিহ্ন

গত ৩ ডিসেম্বর নজিরবিহীনভাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেছেন। গোটা দেশ জুড়ে চড়া হারে মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে লাগামছাড়া ফি, চার্জ ও ভাড়াবৃদ্ধি, লক-আউট ক্লোজার এবং ছাঁটাইয়ের বিরাট ধাক্কায় যখন জনসাধারণ ভেতরে ভেতরে ক্ষোভে ফুঁসছে এবং আসন্ন বাজেটে আবার একদফা আক্রমণের আশঙ্কা করছে, তেমন একটা সময়ে হঠাৎ অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। এর মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকার, একদিকে সাফল্য এবং উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেছে, অন্যদিকে সরকারি তহবিলের শূন্যতার কথা তুলে ভবিষ্যতে কর্মসংকোচন, ভরতুকি হ্রাস, ওয়েজ ও পেনশন ফ্রিজ ইত্যাদির পথও খুলে রেখেছে। ভাবখানা এমন যেন ভবিষ্যতে এসব পদক্ষেপ নিলে অর্থনীতির তরী তরতরিয়ে চলবে।

উন্নয়নের চিত্র আসলে ধাপ্পা

কংগ্রেসের চালু করা যে নয়া আর্থিক নীতি বিজেপি অনেক দ্রুতগতিতে কার্যকরী করছে তার ধাক্কায় সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ লাফ দিয়ে বাড়ছে। ছাঁটাই, ভি আর এসের খড়্গ ঝুলছে শ্রমিক কর্মচারীর মাথার উপর। চাকরি নেই, ব্যবসাবাণিজ্য থমকে দাঁড়িয়েছে চাহিদার অভাবে চাষি ফসলের দাম পাচ্ছে না। জনসাধারণের মনে ক্ষোভ যত ধূমায়িত হচ্ছে, ততই সেই ক্ষোভকে বিপথে চালাতে বিজেপি একদিকে উগ্র হিন্দুত্বের উন্মাদনা, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রচার, দুটোই বাড়াচ্ছে। কিন্তু ক্ষোভ তাতে চাপা পড়ছে না। ফলে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ বিপদের ও হিন্দুত্বের প্রতারণামূলক স্লোগানের সাথে উন্নয়নের ধাপ্পার মিশেল দিয়ে বিজেপি প্রচার চালাচ্ছে। কী কী উন্নয়নের কথা তারা বলছে? তারা বলছে,

১। দেশের ব্যাপক অংশে প্রবল খরা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন ভালো হয়েছে। (বিজেপির সুশাসনে) সরকারি গোলা খাদ্যশস্যে ভর্তি। কাজেই খাদ্য সংকটের আশঙ্কা নেই।

২। এ বছরের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, এই ছয় মাসে রপ্তানি বেড়েছে ১৩.৫ শতাংশ।

৩। বছরের প্রথম ছয় মাসে বৈদেশিক বাণিজ্যে (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) উদ্বৃত্ত হয়েছে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ মার্কিন ডলার।

৪। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ভরে আছে। মার্চ ২০০২তে ছিল ৫৪০১ কোটি ডলার। ছ'মাসে আরও ১২০০ কোটি ডলার যুক্ত হয়ে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬০০ কোটি ডলার।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে এগুলি সবই উন্নতির লক্ষণ, ফলে কংগ্রেসের আর্থিক সংস্কার নীতি বিজেপি'র হাতে পড়ে আরও দ্রুত বেশি সুফল দিচ্ছে। বিজেপি নেতারাও ঠিক এইটাই বোঝাতে চাইছেন। যেসব তথ্য অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন সেগুলিও অসত্য নয়, তবে অর্ধসত্য, যা মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক।

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের ভাঁওতা

প্রথমেই সরকারি শস্য গোলায় রেকর্ড মজুতের প্রশ্নটিই ধরা যাক। বিষয়টা কি এমন যে, দেশের মানুষ দু-বেলা পেটপুরে খাওয়ার পরও খরা, বন্যা ও বিপদের দিনের জন্য সরকার খাদ্য মজুত রেখেছে? আদৌ তা নয়। কেন্দ্রে বিজেপি এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কৃষি ক্ষেত্রে যে উন্নয়নের ছবি দেখিয়ে সাফল্য দাবি করছে, চাষির জীবনে তার ফল মর্মান্তিক। কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত বৃহৎ পুঁজি ও ব্যাঙ্ক পুঁজির বিনিয়োগ ঘটায় এবং আধুনিক বীজ ও সারের কল্যাণে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ অভুক্ত, কারণ তাদের খাদ্যশস্য কেনার ক্ষমতা নেই। কৃষিপণ্যের বিদেশের বাজারেও তীব্র প্রতিযোগিতা। ফলে বিক্রির বাজার না পেয়ে ভারতের কৃষি পুঁজিপতিরা কেন্দ্রের শাসক দলকে দিয়ে সরকারি টাকায় শস্য কেনাচ্ছে। কৃষিপুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে অতীতে কংগ্রেস, পরে সি পি এম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট, এখন বিজেপি সরকারি টাকায় চাল গম কিনে গুদামে ভরেছে, অথচ রেশনে ক্রমাগত দাম বাড়িয়ে যাওয়ায় বিক্রি কমে গিয়েছে। মানুষ না খেয়ে মরছে, অথচ মজুত গম সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত এসেছে। ফলে খরা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদনে ১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং সরকারি গুদামের রেকর্ড মজুত নিয়ে আর যাই হোক গর্ব করা চলে না।

বৃহৎ কৃষিপুঁজিপতি এবং অ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রির মালিকদের স্বার্থে এখন গোটা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে নয়া কৃষিনীতি এনে রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য তৈরির কর্মসূচি সরকার নিচ্ছে। ক্ষুদ্র চাষি কিন্তু অধিক মূল্যে আধুনিক সার বীজ ব্যবহার করে চাষ করার পর বাজারে দাম না পেয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। ঋণের দায়ে অভাবের জ্বালায় গরিব চাষির আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কৃষিপণ্যের ব্যবসা ক্রমাগত বড় পুঁজির মালিকদের কব্জায় চলে যাওয়ায় মজুতদারির কাজে ব্যক্তিগত বড় পুঁজি এমনকি ব্যাঙ্ক পুঁজিও খাটছে। কৃষিপণ্যের বড় ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র চাষির অভাবী বিক্রি সস্তায় কিনে চড়া দরে বেচছে। ফসলের মরশুমে বড় ব্যবসায়ীরা বাজারে কৃষিপণ্যের দাম নামিয়ে দিচ্ছে। ফলে গরিব চাষির চাষের খরচ উঠছে না, খাটুনির দাম তো দূরের কথা।

গরিব চাষির জীবনমানের উন্নয়ন যদি না ঘটে, গরিব মানুষের খেতে না পাওয়ার সমস্যার লাঘব যদি না হয়, তবে সে কেমন কৃষি উন্নয়ন! যে কৃষি উন্নয়ন কেবল মুষ্টিমেয় বৃহৎ কৃষিপুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ায় এবং ক্ষুদ্র চাষিকে সর্বস্বান্ত করে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তেমন উন্নয়ন কি আদৌ গৌরবের?

ছাঁটাই কর্মসংকোচনে জর্জরিত এ কেমন শিল্পোন্নয়ন?

এহেন কৃষি উন্নয়নের ফলে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশের খুব কাছাকাছি ৫.৮ শতাংশে পৌঁছবে বলেও অর্থমন্ত্রী বলেছেন। যদিও সরকারের প্রতিশ্রুত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথমার্ধে শিল্প উৎপাদন বেড়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, গত বছর শিল্প যেমন প্রবল মন্দায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল, এবছর সেই অবস্থা কাটতে শুরু করেছে।

কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে এই আশার বাণীর কোন অর্থ নেই, কারণ বর্তমানে শিল্পোন্নয়ন, উৎপাদনবৃদ্ধি মানেই আরও আধুনিকীকরণ, আরও ছাঁটাই। "শিল্প ঘুরে দাঁড়াচ্ছে" — একথা বলার সাথে সাথেই আসছে দ্বিতীয় শ্রমকমিশনের সুপারিশ, শ্রমিকদের বহু কষ্টার্জিত অধিকারগুলি হরণ ও বাড়তি কাজের বোঝা। চাকরির স্থায়িত্ব, মজুরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ যদি না বাড়ে তবে শিল্পের অগ্রগতি কথাটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে অর্থহীন।

বৈদেশিক বাণিজ্যে অগ্রগতির ভাঁওতা

অন্তর্বর্তী আর্থিক সমীক্ষায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডাইরেকটরেট জেনারেল অব কমার্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকসের দেওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন — এবছর এপ্রিল-সেপ্টেম্বর বর্ষপর্বে রপ্তানি বেড়েছে ১৩.৫ শতাংশ, সেই সময়ে আমদানি বেড়েছে ৮.২ শতাংশ, ফলে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে উদ্বৃত্ত হয়েছে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তাঁরা দেখাতে চাইছেন, বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের দেশ কিনেছে কম, বেচেছে বেশি। নয়া আর্থিক নীতিতে রপ্তানি নির্ভর আর্থিক বিকাশের যে কথা বলা হয়েছে, অর্থমন্ত্রী বলতে চান, সেদিক দিয়ে দেখলে বিজেপি সরকার সফল। সেই সঙ্গেই এক নিঃশ্বাসে অর্থমন্ত্রী বলেছেন গত এক বছরে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ১২০০ কোটি ডলার বেড়ে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬০০ কোটি ডলার। আপাতদৃষ্টিতে ছবিটা বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু সত্য নয়।

হিসাব দীর্ঘমেয়াদী না স্বল্পমেয়াদী তার উপর হিসাবের অনেকটা ওঠা পড়া হয়। কারণ বহু পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা নানা কারণে সাময়িকভাবে বাড়ে কমে। তার উপর শতাংশের হিসাবও বহু সত্য চাপা দিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে ওই একই দপ্তরের দেওয়া দীর্ঘমেয়াদী তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল-সেপ্টেম্বর বর্ষপর্বে রপ্তানি বেড়েছে ১৩.৬৭ শতাংশ। আমদানি বেড়েছে ১২.৩২ শতাংশ। (স্টেটসম্যান ২.১২.০২) কিন্তু দেশের মোট আমদানির পরিমাণ যে রপ্তানির তুলনায় অনেক বেশি — এই সত্যটাই শতাংশের হিসাবের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ওই বর্ষপর্বে মোট বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বিগত বছরের ৫২০ কোটি ৩৩ লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে ৫৫০ কোটি ৪২ লক্ষ ডলারে দাঁড়িয়েছে। (স্টেটসম্যান, ২.১২.০২)। এ থেকেই পরিষ্কার যে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গেই শতাংশের হিসাব দিয়েছে কিন্তু মোট হিসাবটা চেপে গিয়েছে। বস্তুত, '৯১ সালে কংগ্রেস আর্থিক সংস্কার চালু করার পর থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কখনোই কমেনি, ক্রমাগত বেড়েছে। আর্থিক সংস্কারের প্রবক্তারা প্রায়শই বলেন — ৯১ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নয়া আর্থিক নীতি ও উদারীকরণের পথ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না এবং এই নীতি যে কত সফল তার প্রমাণ হল বর্তমানের বিশাল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়।

৯১ সালে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ফাঁকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

কথা বলা যায়না, ব্যবসা করা যায় !

প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের শাসকরাই দেশের মানুষকে বুঝিয়েছে দুটি দেশ পরস্পরের শত্রু। এমন একটা দিন যায় না যে, দু-দেশের সীমানায় গোলাগুলি নিয়ে মহড়া চলেনা। বছরের পর বছর ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ শানিয়ে চলেছে। দুটি দেশের মানুষই খেতে পায় না, তবু দু-দেশ অস্ত্র প্রতিযোগিতার শরিক হয়ে প্রতিরক্ষা বাজেটও বাড়িয়ে আসছে। দু'দেশের শাসকদের মধ্যে কথা বন্ধ। খবর বেরিয়েছে, এই দুই 'শত্রু' দেশ গত ১২ নভেম্বর ইসলামাবাদের মধ্য দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন বসানোর বিষয় নিয়ে মৌ স্বাক্ষর করেছে। গ্যাস পাইপ লাইন সংক্রান্ত এই প্রকল্পের অপর শরিক হচ্ছে ইরান। প্রস্তাবিত এই পাইপ লাইনটি ইরান ও পাকিস্তানের ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে ভারত পর্যন্ত টানা হবে। এই পাইপলাইন বাবদ পাকিস্তান রয়ালটি পাবে বার্ষিক ৫০০ মিলিয়ন ডলার। ভারত নেবে তেল ও গ্যাস। প্রকল্পটি নতুন নয়, কথাবার্তা চলছে বহুদিন ধরেই। এখন চুক্তি হল, অবশ্য খুব গোপনে। (সূত্র ঃ ডেকান হেরাল্ড, ১৫ নভেম্বর ২০০২)

এ ঘটনায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অতীতেও এ ধরনের বিস্তর ঘটনা ঘটেছে। যেমন কারগিলে যুদ্ধের সময়ে কামান-বন্দুকের ধোঁয়ায় যখন উভয়ের সীমানা ভরে গিয়েছে, কারগিল শহিদদের নিয়ে দেশ তখন 'দেশপ্রেমে' উদ্বেল, সেই ঘোর যুদ্ধের দিনেও কিন্তু পাকিস্তান থেকে ভারতে চিনি এসেছে। বেচেছেন পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ, কিনেছেন বাজপেয়ির জামাই। মুনাফা হয়েছিল দু তরফেই, সেখানে শত্রুতা ছিল না। যেমন এখন পাইপ লাইনের প্রশ্নে মৌ সই হচ্ছে তেল ব্যবসায়ী দেশিবিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে। অন্যত্র এরা হিন্দুত্ববাদী, ইসলামী মৌলবাদী যাই হোক, মুনাফার প্রশ্নে এবং মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষ বৈ কি!

উত্তর দিনাজপুরে ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার সর্বস্তরে ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন চালু, বেসকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল ২য় উত্তর দিনাজপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন। ১৮ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট লনে দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে, সারা ভারত ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। অন্যান্য ছাত্রনেতারাও বক্তব্য রাখেন।

১৯ ডিসেম্বর ইনস্টিটিউট হলে প্রতিনিধি অধিবেশনে ২০০ জন ছাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি অধিবেশনে উপরোক্ত দাবিগুলির সাথে জেলায় মহিলা কলেজ স্থাপন, সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগের দাবি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। কমরেড মাধবীলতা পালকে সভানেত্রী এবং কমরেড দুলাল রাজবংশীকে সম্পাদক করে ১৬ জনের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি এবং ৩৯ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

কমরেড স্বপন মণ্ডল লাল সেলাম

বাঁকুড়া জেলার সংগঠক ও ওন্দা আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড স্বপন মণ্ডল মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত রোগে গত ১৬ ডিসেম্বর বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি এস ইউ সি আই-এর সাথে যুক্ত হয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেবার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেন। হিন্দু মুসলিম, উঁচু-নিচু জাত নির্বিশেষে তিনি সকল গরিব মানুষের আপনজন ছিলেন। এলাকার যেকোন অবিচারের ক্ষেত্রে জনতাকে নিয়ে একটি প্রতিবাদের স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নিজ পরিবারের সকলকে দলের সাথে শুধু যুক্তই করেননি, নানান সংস্কার থেকেও তাদেরকে মুক্ত হতে ও সংগ্রামী ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছেন। রাজ্য, জেলা ও স্থানীয় বহু আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

তাঁর মরদেহ নিজগ্রাম চিঙ্গানীতে পৌঁছালে মিছিলে সামিল হন অসংখ্য মানুষ — শ্রদ্ধার্ঘে, চোখের জলে এবং লাল সেলাম জানিয়ে বিদায় দেন তাঁদের আপনজনকে।

কয়েকশো মানুষের সেই মিছিলে মুসলিম মায়েরাও সামিল হয়েছিলেন দলে দলে।

সর্বহারা বিপ্লবী দলের শিক্ষায় জাতপাতের ঊর্ধ্বে এক সংগ্রামী চরিত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে এলাকার ঘরে ঘরে বেঁচে থাকবেন কমরেড স্বপন মণ্ডল।

কমরেড স্বপন মণ্ডল লাল সেলাম

রাষ্ট্রায়ত্ত চটকলগুলি বেসরকারীকরণের চক্রান্ত

বেঙ্গল জুটমিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত চটকলগুলি বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং এই শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের নিরাপত্তার দাবিতে ২৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত চটকলগুলিকে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পরিকল্পিতভাবে বেসরকারীকরণ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে অচল করে রেখে মিলগুলিকে রুগ্নে পর্যবসিত করে বেসরকারি শিল্পমালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চালানো হচ্ছে।

"যেখানে চটশিল্প লাভজনক, চটের বাজার বেড়েছে এবং উৎপাদিত জুটব্যাগের ক্রেতা সরকার — সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই মিলগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অমানবিক এবং অগণতান্ত্রিক। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি। শ্রমিকদের অর্জিত ন্যায়সঙ্গত বেতন মিটিয়ে অবিলম্বে মিলগুলি চালু রাখার ব্যবস্থার দাবি করছি। সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।"

তমলুকে জনস্বাস্থ্য কনভেনশন

২৪ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় তমলুক মানিকতলা মোড়ে। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা হীরেন্দ্রনাথ জানা। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্যের হাল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা তুলে ধরে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী মিশ্র বলেন — যৌবনে স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, এর জন্যই তো স্বাধীনতা। সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এই বৃদ্ধবয়সে জনস্বাস্থ্যের জন্য আন্দোলনে নামতে হয়েছে। আমি এই আন্দোলনে আছি, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই সংগ্রামে আমি থাকব। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সন্তোষ মাইতি, ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য নীলাঞ্জন রায় চৌধুরী, অশোকতরু প্রধান প্রমুখ।

কনভেনশনে রাসবিহারী মিশ্রকে সভাপতি ও ডাঃ সন্তোষ মাইতিকে সম্পাদক করে তমলুক মহকুমা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠিত হয়।

আন্দোলনকারীদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন

একের পাতার পর

উল্লেখযোগ্য বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছে। এই আন্দোলন প্রথমে নিচু থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা তুলনামূলক কম উপার্জন করেন, অনেকে যাঁরা প্রায় 'দিন আনি দিন খাই' স্তরের, তাঁরাই প্রথমে উদ্যোগী হয়েছেন, সবচেয়ে বেশি সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে গেছেন। তারপর উপরের নেতৃত্ব নেমেছেন।

এই আন্দোলন পুনরায় নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটন করেছে দেশি-বিদেশি পুঁজির আশীর্বাদে সি পি এম নেতৃত্বও গদীতে আসীন হয়ে বিজেপি, কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের ন্যায় কত জনবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক, আন্দোলন দমনে কত নৃশংস ও অত্যাচারী। এতৎসত্ত্বেও আপনারা সামান্য হলেও কিছু দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন, যদিও আপনারা আরও সাফল্য অর্জন করতে পারতেন, সরকারকে একেবারে মাথা নিচু করতে বাধ্য করতে পারতেন। সি পি এম বামপন্থী দল হিসাবে একদিন গণআন্দোলনে ছিল, ফলে তারা গণআন্দোলন দমনে অন্যদের থেকে অনেক দক্ষ ও কৌশলী। এজন্যই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থা ও আন্দোলনের ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য বুর্জোয়ারা বারবার ওদের ক্ষমতায় বসাচ্ছে। এখানে প্রয়োজন ছিল, প্রথমত, আপনাদের আন্দোলনের সপক্ষে সর্বস্তরের নাগরিকদের নীরব সমর্থনকে সংগঠিত ও সক্রিয় করানো, জেলায় জেলায় চিকিৎসক, সর্বস্তরের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক, ছাত্র-যুবকদের কনভেনশন অনুষ্ঠান, নাগরিক কমিটি গঠন এবং তাঁরাও যাতে সমর্থনে রাস্তায় নামেন এবং সরকারের উপর কার্যকরী চাপ দেন, তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন ছিল, কর্মবিরতির কয়েকদিন বাদে আবার কতদিন চলবে ঠিক করার জন্য দফায় দফায় ঘোষিত বৈঠক, এ রকম কর্মসূচি না করে দাবি না মানা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল কর্মবিরতি চলবে, প্রথম থেকেই এভাবে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ঘোষণার এবং নিজেদের থেকে বারবার মীমাংসার জন্য এখানে সেখানে ছোটাছুটি না করে সরকারকেই উদ্যোগী হতে বাধ্য করানোর। সেটা না করায় ধূর্ত সরকার ধরে নিয়েছে, এদের লড়াই করার দম বেশি নেই, যেভাবেই হোক আন্দোলন তুলে নেওয়ার জন্য 'মুখ রক্ষা' গোছের একটা মীমাংসা চাইছে। সেজন্য সরকার বারবার নানা ছলচাতুরি ও চালাকি করে গেছে। অথচ আপনারা কিন্তু কর্মবিরতি চালিয়েছেন দীর্ঘদিন। একমাস বাদে আপনারা হয়ত পুনরায় আন্দোলনে নামবেন, ফলে আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন এই আশা নিয়ে এই মতামত রাখলাম।

উচ্চ আদালত আইনজীবীদের ধর্মঘট, কর্মবিরতিকে বেআইনি ঘোষণা করেছে, এই কথা বলে আপনাদের মনোবল দুর্বল করার ষড়যন্ত্র চলছে। আপনাদের মনে রাখতে হবে ন্যায়ের দাবি আইনের চেয়েও বড়। যেকোন দেশে যেকোন যুগে অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই ও শোষণমুক্তির জন্য সংগ্রাম প্রচলিত আইন ও আদালতের ছাড়পত্র নিয়ে হয় না বরং তাকে অমান্য করেই করতে হয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও আইন অমান্য করেই শুরু হয়েছিল। আইনের চোখে নেতাজি, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, মাস্টারদারা অপরাধীই ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের ন্যায়বিচার কি বলে? তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ '৬৭ সালের ২৪শে এপ্রিল এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, ''Every student of ethics and jurisprudence knows that everything legal is not necessarily legitimate, justified and moral. Naturally everything illegal in the eye of law is not necessarily unjustified illegitimate and immoral''. অর্থাৎ, ন্যায়নীতির ছাত্রমাত্রেই জানেন, যাহাই আইনসঙ্গত, তাহাই সবসময় ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিকতাসম্মত নাও হতে পারে। আবার, কোন জিনিস প্রচলিত আইনের চোখে বে-আইনি হলেই তা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অমানবিক হয় না। আশা করি, আপনারা বলিষ্ঠ চিন্তা, ন্যায়বুদ্ধি ও উন্নত নৈতিক বলের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংগ্রামী মনোবল রক্ষা করে যাবেন।

আপনারা জানেন, আমরা প্রথম থেকেই সাধ্যমত আপনাদের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পক্ষে কিছু কর্মসূচি পালন করেছি। গত ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী সংহতি দিবসও উদ্‌যাপন করেছি। আমরা আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সহ নানা আন্দোলনের যে কর্মসূচি নিয়েছি তার দাবিসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবি। এছাড়া বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, বর্ধিত ছাত্র ফি, হাসপাতালের চার্জ বৃদ্ধি প্রত্যাহার, শ্রমিক ও কৃষকদের উপর বিভিন্ন আক্রমণ বন্ধ ইত্যাদিও রয়েছে। আশা করি, এই আন্দোলনকেও সফল করতে আপনারা এগিয়ে আসবেন।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনারা একমাস বাদে আরও উন্নত শক্তিশালী ও সুসংগঠিত আন্দোলন করে সরকারকে বর্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে পারবেন।

আইনজীবীদের আন্দোলন
কয়েকটি কথা

আইনজীবীদের ৪৪ দিনের বীরত্বপূর্ণ কর্মবিরতি সংগ্রামী তেজে ও তাৎপর্যে ঐতিহাসিক। সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এবং শাসক সিপিএম নেতাদের হুমকি, পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের হামলা, সর্বোপরি সিপিএম প্রভাবিত আইনজীবী সংগঠনের নেতৃত্বের আন্দোলন-বিরোধী ভূমিকা সত্ত্বেও প্রবল আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করে যেভাবে আইনজীবী, মুহুরি, মোক্তার এবং ল-ক্লার্করা লড়াই চালিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আইনজীবীদের এই আন্দোলন ছিল পুরোপুরি জনস্বার্থে এবং সেই অর্থে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিপুল সংখ্যক সাধারণ আইনজীবী, বিশেষত তরুণ আইনজীবী, মোক্তার, মুহুরি, ল-ক্লার্ক — প্রতিদিনের রোজগারের উপর যাঁরা দিন চালান, তাঁরাই ছিলেন এই আন্দোলনের মেরুদন্ড। আর শোষণ-অত্যাচারে জর্জরিত বিক্ষুব্ধ জনগণের সংগ্রামী সমর্থনই ছিল এই আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। ছাঁটাই বেকারি প্রবল আর্থিক সংকটে জর্জরিত কোটি কোটি সাধারণ মানুষের বুকের ভেতর গুমরে ওঠা যে ব্যথা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে, আইনজীবীদের আন্দোলনে ছিল তারই প্রতিফলন। এই কারণেই সিপিএম নেতৃত্ব অপপ্রচার এবং গায়ের জোর এ দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েও আন্দোলন ভাঙতে পারেনি। জনতার লড়াকু মেজাজ ও সমর্থন সরকারি অপপ্রচারকে জমি পেতে দেয়নি।

আইনজীবীদের ন্যায়সংগত আন্দোলনের পক্ষে জনসাধারণের এই সমর্থনকে লক্ষ্য করেই জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে সিপিএম নেতৃত্ব অত্যন্ত হীন কৌশলী প্রচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেছিলেন — আইনজীবীরা বিশাল অঙ্কের যে ফি নেন, তাঁর থেকে মক্কেলদের তাঁরা কিছুটা ছাড় দিতে পারেন। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে এইটে বোঝানো যে, যাঁরা বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে এত ফি নেন, তাঁরা কোর্ট-ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়েন কোন অধিকারে ! অথচ, প্রকৃত সত্য হল, শহর ও মফঃস্বলের বিপুলসংখ্যক আইনজীবীদের মধ্যে এমন নামীদামী আইনজীবীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। সিপিএম-ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবী বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির জন্য গোয়েঙ্কার হয়ে ওকালতি করতে যেমন হাজার হাজার টাকা ফি নিয়েছেন — তেমন আইনজীবী মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় আইনজীবীদের মক্কেলরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোয়েঙ্কার মতই শিল্পপতি গোষ্ঠী বা ধনী সম্প্রদায়, কোর্ট ফি বৃদ্ধিতে যাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অন্যদিকে বেশিরভাগ আইনজীবীর অবস্থা হচ্ছে তাঁরা প্রতিদিনের রোজগারের উপর নির্ভরশীল, একথা জনসাধারণও জানেন। ফলে এই প্রচারের দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায়নি। তাছাড়া জনগণের মধ্যে আন্দোলনবিরোধী মানসিকতা তৈরি করতে সিপিএম নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আদালত অচল থাকায় বহু বন্দীর জামিন না পাওয়া এবং কারাগারগুলিতে উপচে পড়ার ঘটনা বিপুলভাবে প্রচার করে জনসাধারণের কত অসুবিধা হচ্ছে তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত অসুবিধা এবং কষ্ট সহ্য করেও বিচারপ্রার্থীরা আন্দোলনরত আইনজীবীদের পক্ষেই থেকেছেন। বহু জায়গায় আন্দোলনকারীদের মনোবল ভাঙার জন্য আইনজীবীরা কাজে যোগ দিতে চাইছেন বলেও তারা প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। আন্দোলন ভাঙতে না পেরে শেষপর্যন্ত সিপিএম নেতৃত্ব ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদী রাস্তা নিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক আইনজীবীরা কর্মবিরতি ভেঙে আদালতে যাবেন, বিচারপ্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে। কোন্ বিচারপ্রার্থীদের কথা তাঁরা বলেছিলেন ? বাস্তবে বিচারপ্রার্থীরা নয়, আন্দোলন ভাঙতে এসেছিল পুলিশ এবং তাদের দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা। কিন্তু মারধোর করেও তারা আন্দোলনের গতিরোধ করতে পারেনি। আইনজীবীদের মনোবলের সামনে তাদের হঠতে হয়েছে। আইনজীবীদের ঐক্য ভাঙতে সিপিএম নেতৃত্ব এমনকি দলীয় প্রভাব খাটিয়েও শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। ডেমোক্রেটিক ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে নীচুতলার বহু সদস্য ও সাধারণ আইনজীবীরা কর্মবিরতি চালিয়ে গিয়েছেন।

আমাদের দল শুরু থেকেই এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার। আইনজীবীদের এই সংগ্রামী সংগঠন রাজ্য জুড়ে আন্দোলনকে আরও তীব্র করার নিরলস চেষ্টা চালিয়েছে। এই আন্দোলন একদিকে সরকার এবং সিপিএম নেতৃত্বের আন্দোলনবিরোধী, অগণতান্ত্রিক চেহারাটা যেমন নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি দেখিয়ে দিয়েছে আপাতদৃষ্টিতে সরকারের শক্তি যত বেশিই মনে হোক, আন্দোলনের শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের মতো একটা চূড়ান্ত জনবিরোধী, আন্দোলনবিরোধী, মারমুখী উদ্ধত সরকারকেও আইনজীবীদের আন্দোলনের সামনে আংশিক নতি স্বীকার করতে হয়েছে। যে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় কড়া হাতে আন্দোলন দমনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মালিকশ্রেণীকে, আন্দোলনকারী মানুষের ওপর লাঠি, গুলি চালাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, সেই সরকার শেষপর্যন্ত আইনজীবীদের দাবি আংশিক মেনে নিয়ে কোর্ট-ফি সংশোধন করে নতুন আইন চালু করতে বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনের এই সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরকার বলেছিল, আইনজীবীরা যতদিন খুশি কর্মবিরতি চালিয়ে যেতে পারেন কোন অবস্থায় তাদের দাবি মানা হবে না। সরকারের এই চরম ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব দিয়েছে এই আন্দোলন। তাই দেশের সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন। এই আন্দোলন শুধু আইনজীবীদের নয়, সামগ্রিকভাবে শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

এই আন্দোলন যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখে গিয়েছে আইনজীবীদের তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। আংশিক জয় এবং সরকারি প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবীরা এক মাস সময় দিয়েছেন। যে সরকার আইনজীবীদের মতো সামাজিকভাবে সম্মানীয় মানুষদের সাথে এহেন আচরণ করতে পারে এবং মারাত্মক হুমকি সহ গুন্ডা-পুলিশ দিয়ে তাদের দমনের চেষ্টা করতে পারে, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী তা সহজেই অনুমেয়। ফলে একথা পরিষ্কার যে, এহেন চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক জনবিরোধী সরকার সহজে দাবি মেনে নেবে না। বরং আন্দোলন যাতে আর না গড়ে উঠতে পারে তার জন্য আন্দোলনকারীদের মনোবল ও সংহতি ভেঙে দেওয়া সহ সবরকম প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাবে। ফলে, সরকারের আশ্বাসে অপেক্ষা ও থেমে থাকা নয়, আন্দোলনের মানসিকতা ও মনোবল ধরে রাখা ও আরও তীব্র করা এবং আন্দোলনের সংগঠন ও সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য সচেতন সক্রিয় প্রয়াস এই মুহূর্ত থেকেই চালিয়ে যেতে হবে। এই চাপ রক্ষা করতে না পারলে সরকারকে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করানো যাবেনা। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী এই এক মাস সময়ের মধ্যে নিরলস চেষ্টায় আন্দোলনের দুর্বলতার দিকগুলি খুঁটিয়ে বিচার করে তা যথাসম্ভব দূর করতে হবে।

এবারের আন্দোলন ছিল মূলত স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রের। এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের উপর গড়ে ওঠা আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারে না। চূড়ান্ত জয়ের লক্ষ্যে আন্দোলনকে পৌঁছে দিতে হলে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনকে একেবারে নীচু স্তর থেকে সাংগঠনিক রূপ দিতে হবে। প্রতিটি কোর্টে আন্দোলনের কমিটি গঠন করতে হবে। তার সাথে, যে ব্যাপক জনগণ এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন তাঁদের সমর্থনকেও সাংগঠনিকভাবে এর সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে, সম্পূর্ণ দাবি আদায় করার মতো যে শক্তি এই আন্দোলনের মধ্যে নিহিত আছে সচেতনভাবে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। সাফল্য যতটুকু এসেছে তার চেয়েও অনেক বড় সাফল্যের সম্ভাবনা এই আন্দোলনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আগামীদিনে আরও সুসংহত ও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা আশা করি আগামী এক মাস আইনজীবীরা সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে আরও দুর্বার আন্দোলনের প্রস্তুতি নেবেন এবং সম্পূর্ণ বিজয় অর্জনের দিকে এগোবেন। রাজ্যের সংগ্রামী জনগণের নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন তাদের দিকে আছে ও থাকবে।

এ আই কে কে এম এস-এর
মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

'বামফ্রন্ট সরকারের নয়া কৃষিনীতি জ্বালিয়ে দাও', 'কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা চলবে না', 'খাজনা বৃদ্ধি কোন মতেই মানছি না মানব না', 'ফসলের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন সহস্রাধিক জনতার সমাবেশে। দিনটা ছিল ২১ ডিসেম্বর, স্থান মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরে নেতাজী পার্ক। ঐদিন ছিল সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের (এ আই কে কে এম এস) ৮ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই দলের সুপরিচিত বিধায়ক জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। জনস্বার্থ বিরোধী এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য এবং আগামী ২৭ জানুয়ারি এস ইউ সি আই আহূত ২৪ ঘণ্টার বাংলা বন্ধ সর্বাত্মক ভাবে সফল করার জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শেখ খোদাবক্স বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিনীতি, খাজনানীতি, সেচকরবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেশের গরিব কৃষক ক্ষেতমজুর ভাগচাষিকে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে তার উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন।

সভার শুরুতে সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সাজেম আলি, কেন এই কৃষক সম্মেলন তার উপর বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে প্রতিনিধি অধিবেশন হয় ইসলামপুর হাইস্কুলে। এই অধিবেশনে জেলা ও রাজ্যের সাধারণ মানুষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমস্যা নিয়ে উত্থাপিত ৬টি প্রস্তাব এবং জেলা সম্পাদক সাজেম আলির সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। অধিবেশনে এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে এই সম্মেলনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। পরিশেষে জেলার কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড ধনঞ্জয় ঘোষ ও কমরেড সাজেম আলিকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ৪৮ জনকে নিয়ে এক শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়। উভয় সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক ক্ষেতমজুর আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক ও জননেতা কমরেড মদন সরকার।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতাল চত্বরে মিটিং করছেন

নিখোঁজ রোগীর মৃতদেহ হাসপাতালের বাথরুমে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক জেলা হাসপাতালের জমিতে স্টল বানিয়ে বিক্রী করে হাসপাতালের অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। ২৪ ডিসেম্বর ঐ স্টলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মিটিং করতে যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যস্ত তখন নকুল মাইতি নামক ৪৫ বছরের এক রোগীকে তাঁর বেডে না পেয়ে তাঁর বাড়ির লোকেরা খোঁজাখুঁজি করছে। হাসপাতালের জনৈক কর্মচারী বলেন, 'দেখুন রোগী হয়তো বাড়ি চলে গেছে।' রোগীর বাড়ি তমলুক শহর সংলগ্ন দক্ষিণ চড়া। দুদিন আগে পেটখারাপ ও হাতপায়ের যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ডাক্তার রোগীকে সুস্থ হয়ে যাওয়ায় ছুটি দিয়ে দেন। যেহেতু ঐদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালে আসছেন তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে সকালে না নিয়ে গিয়ে বিকালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ির লোকদের বলেন। বিকালে দেখা যায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন বাথরুমে। রোগীর বাড়ির লোকেদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। মৃত নকুল মাইতির আত্মীয়া গীতা মাইতি (সি পি এম পঞ্চায়েত সদস্য) চিৎকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে ডায়াসে বক্তৃতারত স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ঘটনা জানাতে গেলে তমলুকের সি পি এম এম পি লক্ষ্মণ শেঠ তাঁকে ডায়াস থেকে নামিয়ে দেন। এরপর সি পি এম নেতা কর্মীরা ঘটনা চাপা দিতে তৎপর হয়। ময়না তদন্ত ছাড়াই দ্রুততার সঙ্গে মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মৃত নকুল মাইতি ও তার ছেলেরা দিনমজুরি করে সংসার চালাত। এমন আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় তারা উদ্‌ভ্রান্ত। সি পি এম নেতা কর্মীরা নকুল মাইতির ছেলে মেয়েদের অন্য কারো সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দেয়। কিন্তু ঘটনার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি ও এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ২৬ ডিসেম্বর নকুল মাইতির অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত, দোষীদের শাস্তি এবং মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে হাসপাতাল মোড়ে বিক্ষোভ পথ অবরোধ করা হয়। এরপর সি এম ও এইচ-কে ঘেরাও করা হয়। সি এম ও এইচ উপযুক্ত তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও মুক্ত করা হয়। এরপর হাসপাতাল সুপার ও জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবিগুলি পেশ করা হয়। মৃত নকুল মাইতির ছেলে এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে অংশ নিয়ে বলেন, সি পি এম সব ব্যাপারটা দেখবে বলে তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবার ময়না তদন্ত না করিয়ে দেহ দ্রুত সৎকার করতে বলে। তিনি সি এম ও এইচ ও হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তদন্তের দাবি জানান। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন তমলুক মহকুমা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সভাপতি প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী মিশ্র, সম্পাদক ডাঃ সন্তোষ মাইতি, মন্মথ দাস, অশোকতরু প্রধান প্রমুখ।

গভীর সংকটেরই চিহ্ন

তিনের পাতার পর

হয়ে গিয়েছিল কেন? এ প্রশ্নটা উদারীকরণের প্রবক্তারা মোটেই তোলে না। কারণ তাহলেই বেরিয়ে আসবে যে, ইন্দিরা গান্ধির সরকারের শেষ দিকে, বিশেষ করে রাজীব গান্ধির সময় গৃহীত উদারীকরণ নীতির ফলে ভারতের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে যে বেহিসাবি আমদানি বৃদ্ধি ঘটেছিল, তার দায় মেটাতেই বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার ফাঁকা হয়ে যায়। অর্থাৎ উদারীকরণের ফলেই বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ফাঁকা হয়েছে। অথচ বিশ্বায়নের প্রবক্তারা বলছেন সেই উদারীকরণই হল এই রোগের দাওয়াই। আসলে এটি যুক্তি নয়, অজুহাত। ঠিক তেমনিই তাঁরা বলছেন বিশ্বায়নের স্রোতে গা ভাসিয়েই বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ ডলার জমা হয়েছে, এটিই উন্নয়নের পথ।

বিদেশি মুদ্রার স্ফীত ভাণ্ডার সংকটেরই প্রতিফলন

এ বিষয়ে দুটি প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। এক, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার এত ফুলে ফেঁপে ওঠাটা কি পুঁজিবাদী উন্নয়নের অর্থেও সুলক্ষণ? নাকি অর্থনীতির অগ্রগতি থমকে যাওয়ার প্রমাণ? প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়টিই সত্যি। এটি আসলে অলস পুঁজির ভাণ্ডার। দেশের কোটি কোটি মানুষের ন্যূনতম খাদ্যটুকু কেনার সংস্থান নেই, শিল্পদ্রব্য কেনা তো দূরের কথা। ফলে আভ্যন্তরীণ বাজার নেই। বিদেশের বাজারেও বহু প্রতিযোগী। সেখানেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। কাজেই দেশে শেয়ার বা ফাটকা বাজার বাদ দিলে নতুন শিল্পে বিনিয়োগ নেই। যে হারে ডলার এসেছে সেই হারে বিনিয়োগ না হওয়ায় জমে যাওয়া ডলার, যা আসলে সঙ্কটেরই প্রতিফলন, তাকেই বিজেপি সাফল্য বলে চালাতে চাইছে।

সরকার বলতে পারে, বিনিয়োগ হোক বা না হোক, এত ডলার আসাটাই একটা সাফল্য। যদি বাণিজ্য করে ডলারটা আসত, তবে একটা কথা হয়ত হতে পারত, কিন্তু আমরা দেখেছি বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ক্রমাগত বাড়ছে। এ-অবস্থায় শুধু আমরা নয়, প্রচলিত অর্থনীতির পাঠ্য বইতেই (দ্রঃ ইণ্ডিয়ান ইকনমি, দত্ত ও সুন্দরম, ২০০২ সং) প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এই বিশাল মজুত আসলে অর্থনীতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, কারণ এর মূলে রয়েছে বিরাট অঙ্কের ঋণ, নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য (এইড) এবং অনাবাসী ভারতীয়দের আমানত। ঋণ এবং আমানতে যেমন সুদ দিতে হয় তেমন বৈদেশিক সাহায্যের জন্যও রয়্যালটি, ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি দিতে হয়। কাজেই বিনিয়োগ করতে না পারার ফলে সঞ্চিত বিশাল মুদ্রাভাণ্ডার থেকে আয় নেই অথচ ব্যয় আছে। অর্থাৎ এটা দায়, যার সুদ এবং আসলের প্রতিটি পাইপয়সা গুণতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকে।

জি ডি পি বৃদ্ধির কারচুপি

ইদানিং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নজির হিসাবে জি ডি পি বৃদ্ধির হিসাব দাখিল করা অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সকলেই জানেন, এর দ্বারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রুজিরোজগারের সুযোগ বৃদ্ধি বা আর্থিক উন্নতি বোঝায় না। মুষ্টিমেয়ের বিপুল মুনাফা হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ক্রমাগত অধিকতর গরিব হতে থাকলেও গড় হিসাবে গরিব মানুষেরও কাগজ কলমে আয় বাড়ে। তাই সরকারি বা অফিসিয়াল হিসাবপত্রে সর্বদাই গড় হিসাব দেয়, যার তলায় গরিবের কান্না চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সেই লোকঠকানো গড়ের হিসাবেও এখন ভেজাল মেশানো হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখাবার জন্য ইদানিং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকেও (এফ ডি আই) আয় হিসাবে ধরে জি ডি পি অনেকখানি বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। অথচ এটা আয়ও নয়, উৎপাদনও নয়। প্রথমত, প্রত্যক্ষ বিনিয়োজিত বিদেশি পুঁজির মালিক বিদেশি। সেই পুঁজি উৎপাদনেই বিনিয়োজিত হবে, অথবা এদেশেই থাকবে চিরকাল, এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট আশা করছে এবছর ১০০০ কোটি ডলার বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আসবে। কিন্তু এমন আশার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক খুবই সামান্য। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ৩৪০ কোটি ডলার। সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যদি ৮ শতাংশ জি ডি পি বৃদ্ধি করতে হয় তবে আগামী পাঁচ বছরে ২৫০০ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ আনতে হবে। কত আসবে তা জানা নেই, তবে যতটাই আসুক সবটাই জি ডি পি'র সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখানোর লোকঠকানো খেলা চলবে।

অগ্রগতির দাম দিতে গিয়ে গরিব মধ্যবিত্ত মরবে

বিদেশি বিনিয়োগ পর্যাপ্ত এলেও সাধারণ মানুষের আদৌ কোন লাভ নেই। কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ টানার নামে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে তা মেহনতি মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনছে। সেই সর্বনাশা পদক্ষেপগুলির গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে "ইনভেস্টমেণ্ট ফ্রেণ্ডলি" (বিনিয়োগ বন্ধু) নীতি। নানা দেশই এখন বিদেশি বিনিয়োগ চাইছে। তাদের হারিয়ে বিদেশি পুঁজিকে এদেশে টেনে আনতে গেলে বেশি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে; লভ্যাংশ ডলারে পরিবর্তিত করে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে; যখন ইচ্ছা পুঁজি তুলে নেওয়ার, ইচ্ছামতো বেতন দেওয়া ও ইচ্ছামতো ছাঁটাইয়ের অধিকার দিতে হবে, সরকারি খরচে পথ ঘাট ঝকঝকে করে দিতে হবে; ঝুপড়ি বস্তি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে শহরকে মালিকশ্রেণীর চোখে 'সুন্দর' করতে হবে, মালিকদের ওপর কর কমাতে হবে; তাদের বিনোদনের জন্য বেলেল্লাপনার ও জুয়ার আড্ডা খুলতে হবে ইত্যাদি। এই সবকিছুর মাশুল শেষপর্যন্ত দিতে হবে মেহনতি সাধারণ মানুষকে। আর্থিক উন্নয়নের বিজয়রথের চাকার তলায় বলি হবে গরিব ও মধ্যবিত্ত।

অর্থমন্ত্রীর সমীক্ষায় সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি এও গেয়ে রাখা হয়েছে যে সরকারি তহবিলের হাল খুব খারাপ। কেন খারাপ? সে প্রশ্নে অর্থমন্ত্রী ঢোকেননি। কারণ তাহলেই একথা বেরিয়ে পড়বে যে সরকারের আর্থিক সংকটের প্রধান কারণগুলির একটা হল মালিকশ্রেণীকে ঢালাও কর ছাড় দেওয়া অপরটি হল দুর্নীতি। মাত্র কয়েক বছর ক্ষমতায় থাকার সুযোগেই বিজেপি দুর্নীতিতে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এক ইউনিট ট্রাস্টকে লুঠেই তারা লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে পথে বসিয়েছে। ইউনিট ট্রাস্টের বেহাল অবস্থা সরকার জানত না, অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্য যে সত্য নয় জেপিএ রিপোর্টে তা বেরিয়ে এসেছে। বিজেপি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের লুঠের ফলে ধবসে পড়া ইউনিট ট্রাস্টকে খাড়া করার নামে বিজেপি সরকার নতুন করে সরকারি তহবিল থেকে ৮০০০ কোটি টাকা দেবে। অর্থাৎ লুটের টাকার একটা অংশ তারা সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি দেবে। এখানে তাদের টাকার অভাব নেই। অথচ সংকটের অজুহাত দেখিয়ে জনকল্যাণমূলক ভরতুকি তুলে দেওয়া, খাদ্য, সার, গ্যাস, কেরোসিনের দাম বাড়ানো, কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের নিয়মানুগ বেতনবৃদ্ধি বন্ধ রাখা, নিয়োগ বন্ধ ও উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে কর্মচারী ছাঁটাই করাকে তারা যুক্তিসঙ্গত বলে দেখাতে চাইছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ইতিমধ্যেই ৭,৯২৩টি চাকরির পদ তাঁরা বিলুপ্ত করেছেন, উদ্বৃত্ত বলে চিহ্নিত আরও ২৩,৪২৬টি পদ আগামী দিনে বিলুপ্ত করা হবে। সরকারের আর্থিক সংকট এবং ভরতুকি তোলার ডামাডোলে দেশের রপ্তানিকারক শিল্পপতিরা বিলগ্নীকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরির কাছে অনুরোধ করেছেন — আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক এবং ১০এ, ১০বি, ৮০ এইচ এইচ সি ধারায় আয়করে যে ছাড় তাঁরা পান সরকার তা যেন বজায় রাখে। মন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন সরকার তাঁদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে। অর্থাৎ মালিকদের ভরতুকি থাকবে। কিন্তু দেশের কোটি কোটি গরিব ও মধ্যবিত্তের জন্য সহানুভূতির প্রশ্ন নেই। 'অগ্রগতি' হোক না হোক মালিকশ্রেণীর মুনাফা যাতে অটুট থাকে সরকার তা দেখবে। কারণ এই সরকার, এই রাষ্ট্র মালিকশ্রেণীর রাষ্ট্র, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র। ফলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে তথাকথিত অগ্রগতির মূল্য মেটাতে গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ মরছে এবং মরবে, যদি না আন্দোলনের চাপে এই সর্বনাশা নীতিকে রুখে দেওয়া যায়।

সরকারি কোষাগারের টাকা যাচ্ছে কোথায়?

ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের কথা বলে রাজ্য সরকার আগামী বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ৭৫% ছাঁটাই করতে চলেছে। তার ফলে চলতি আর্থিক বছরের ১৯৯০ কোটি টাকার পরিবর্তে আগামী আর্থিক বছরে (২০০৩-২০০৪) এই খাতে বরাদ্দ হবে মাত্র ৫১২ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এর ফলে বিপুল পরিমাণে কাটছাঁট নয়তো বাতিল করতে হবে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মন্ত্রী নিরুপম সেন বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কথা বলা শুরু করলেও শরিক দলগুলি ইতিমধ্যেই সরকারি এই পরিকল্পনা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, মন্ত্রী আমলাদের গাড়ি, বাড়ি, মাস মাইনে বাবদ চলতি বছরের বরাদ্দ ৪৫০০ থেকে ৫০০০ কোটি টাকার কতটা ছাঁটাই করবে রাজ্য সরকার।

আজ দেশের প্রতিটি রাজ্য এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার বলছে সরকারি তহবিলে টাকা নেই, সরকার জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের কোন দায়িত্ব নিতে পারবে না, কোন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কার্যকরী করতে পারবেনা। কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে, জনগণ যে ট্যাক্স দিচ্ছে, যার মাত্রা আবার প্রতিদিন বাড়ছে, সেই ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি তহবিলের আজ এই হাল কেন? এতো টাকা যাচ্ছে কোথায়?

কেন্দ্রীয় সরকার যেমন কেন্দ্রীয় বাজেটে সবচেয়ে বেশি অংশ ব্যয় করে ঋণের সুদ মেটাতে, তারপর সামরিক খাতে, মন্ত্রী, আমলাদের পুষতে; রাজ্য সরকারি তহবিলের ব্যয়বরাদ্দের হিসাবটিও ঠিক তাই। গতবারের রাজ্য বাজেটে পুলিশ খাতে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তা থেকে এই আর্থিক বছরে (২০০২-০৩) ৫৩ কোটি টাকা বাড়িয়ে তা ১০৬২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। চরম আর্থিক সঙ্কটের কথা বললেও রাজ্য সরকার পুলিশের বুলেট, বন্দুক কিনতে ৬ কোটি টাকা বরাত দিয়েছে আগস্ট মাসে (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪.৮.০২)। হাজার হাজার কোটি টাকা মালিকদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকারি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গোয়েঙ্কা পরিচালিত সি-ই-এস-সি'কে ২৬৬ কোটি টাকা ভর্তুকি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকার রিলায়েন্স ইণ্ডাস্ট্রিকে ১৫০ কোটি টাকা ছাড় দিচ্ছে। (সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ২০.১২.০২) এবারের বাজেটেও অনাদায়ী বিক্রয় করের উপর রাজ্য সুদ কমিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যবসায়ীরা ক্রেতার কাছ থেকে সেলস্ ট্যাক্স আদায় করেও সেই টাকার প্রদত্ত অংশ রাজ্য কোষাগারে জমা দেয় না — তাদের জন্যই এই পুরস্কার।

রাজ্যের মন্ত্রী, আমলা, মায় সরকারি দলের নেতাদেরও জীবনযাত্রা প্রায় মধ্যযুগীয় রাজা জমিদারদের মতো বিলাসবহুল। সম্প্রতি সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিবাবুর গাড়ি কেলেঙ্কারির কথা। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হলেও এখন জ্যোতিবাবু কোন সরকারি পদে নেই। অথচ তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে বাড়ি-গাড়ি-ফোন-বিদ্যুৎ সব কিছুর বিল মেটায় রাজ্য সরকার। গাড়ি কেলেঙ্কারিতে প্রকাশিত — জ্যোতিবাবুর জন্য নির্ধারিত তৃতীয় গাড়িটি, যেটি প্রথম দুটি বুলেট প্রুফ গাড়ি অকেজো হলে ব্যবহার করার কথা, সেটিরও তেল এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৮ মাস ২২ দিনে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯০০ টাকা। এর জন্য ৭ মাসে ড্রাইভারকে মাইনে দিতে হয়েছে ৩৭ হাজার ২৮৯ টাকা। গাড়ির তেল খরচ অনুযায়ী এই অল্প সময়ে ৫০ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমার কি হিসাব দেবেন জ্যোতিবাবু বা তার দলের পরিচালনাধীন রাজ্য সরকার? (বর্তমান ১০.১২.০২)

এই মাপের বিলাসবহুলতার সাথে আছে রাজ্য সরকারের চরম দুর্নীতি। সরকারি সম্পত্তি, জমি জলের দরে বিকিয়ে দেওয়া ছাড়াও বানতলা চর্মনগরীর জমি জলের দরে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে সরকারি আমলা মন্ত্রীরা কাটমানি খেয়েছে বলে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে।

গত জুন-জুলাই মাস থেকে কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেলের (ক্যাগ) রিপোর্ট সংবাদপত্রে পর পর প্রকাশিত হয়েছে। দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়ামাত্র প্রকাশ করে এই রিপোর্টগুলি দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের বিলাসব্যসন, সরকারি কাজে ঢিলেমি, অপদার্থতা ও তার সাথে মন্ত্রী-আমলাদের সাথে মিলে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের দুর্নীতির ফলে কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্য সরকারের দপ্তর স্থানান্তরের জন্য নতুন বাড়ি কেনা বা ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে বিশাল অঙ্কের টাকা জলে ফেলা হয়েছে। বিধাননগর পুরভবনে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা সেলামি দিয়ে অর্থদপ্তরের জন্য ৩৪ হাজার বর্গফুট জায়গা ভাড়া নিয়েছে রাজ্য সরকার। ২৪ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ভাড়া গোনা হচ্ছে, যা সরকারি রেটের তুলনায় অনেক বেশি, অথচ দপ্তর স্থানান্তরিত হয়নি। স্ট্র্যাণ্ড রোডে ২৫ কোটি টাকায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য বিল্ডিং, পূর্ত দপ্তরের জন্য ক্যামাক স্ট্রীটে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বানানো বাড়ি, ৪০ কোটি টাকায় নলবন ভেড়ি এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য তৈরি বাড়ির কোনটিতেই নির্দিষ্ট দপ্তরগুলি স্থানা-ন্তরিত হয়নি (সংবাদ প্রতিদিন, ২৭.৯.০২)।

সেচ দপ্তরের পরিকল্পনার অভাবে খাসকল-দৌলতালা এলাকায় গঙ্গার ভাঙন রোধে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা অপব্যয় হয়েছে (সূত্র ঃ দি স্টেটস্ম্যান, ২৭.৭.০২)। রাজ্য সরকারের গড়িমসিতে রাণীগঞ্জ এলাকায় রনাই খনি প্রকল্প এখনো শুরুই হয়নি, যা চালু হলে এক পয়সাও খরচ না করে সেস বাবদ রাজ্য সরকারের লাভ হবে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২.৭.০২)।

কেন্দ্রীয় সরকারের কার্গিল যুদ্ধের কফিন কেলেঙ্কারির মতো রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের পলিথিন কেলেঙ্কারিও প্রকাশিত হয়েছে সরকারি রিপোর্টে। কংসাবতী প্রকল্পের জন্য দ্বিগুণ দামে (কিলোপিছু ৬৫ টাকার পরিবর্তে ১২৫ টাকায়) পলিথিন কিনে বেশিরভাগ অংশই ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলে গুদামে ফেলে রাখা হয়েছে। এর টেণ্ডার নিয়েও দুর্নীতি প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে সরকারি আনুকূল্যে স্থানীয় ঠিকাদারদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.৭.০২)।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের দুর্নীতিতে ১০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা উপরি লাভ করেছে চালকল মালিকরা — এই রিপোর্টও দিয়েছে ক্যাগ (সূত্র ঃ দি স্টেটস্ম্যান, ২৪.৮.০২)।

সবচেয়ে বড় কথা এই দুর্নীতি প্রকাশ করে দিয়েছে যে ক্যাগ দপ্তর, যার জন্য সরকার বছরে ৫ কোটি টাকা খরচ করে, ১০০০ জন কর্মীর মাইনে গোনে, সেই সরকারি দপ্তরটির রিপোর্টের কোন মূল্যই দেয় না রাজ্য সরকার। সরকারি দপ্তরের অনিয়ম দুর্নীতি দূর করার জন্য দপ্তর পুষেও এই দুর্নীতি বছরের পর বছর চলছে এবং তা বাড়ছে বলে অভিযোগ খোদ ক্যাগ দপ্তরের (সূত্র ঃ হিন্দুস্তান টাইমস্ ১০.৭.০২)।

তাই দুর্নীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারি, সন্ত্রাসবাদ দমনের ধূয়া তুলে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের সামরিক-আধা সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর মতোই রাজ্যের পুলিশ বাজেটে আরও কোটি কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়ে, নেতা মন্ত্রী আমলাদের জমিদারি মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খরচ করে চললে সরকারি তহবিল তো ফাঁকা হবেই। তাই 'ভর্তুকি' বন্ধের নামে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খরচ বাতিল করে, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা।

এই সামগ্রিক বিষয়টির আরও একটি দিক আছে। যে উন্নয়নের সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে

আটের পাতায় দেখুন

মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিল সরকার

একের পাতার পর

নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

এই অবস্থায় গত ১৬ ডিসেম্বর মৎস্যজীবীরা মরিয়া হয়ে বাংলাদেশের ২৭২ জন মৎস্যশিকারি সহ ১৪টি ট্রলার ও ৬টি বাংলাদেশী নৌকাকে ধরে ফেলে এবং ২০ ডিসেম্বর তাদের পাথরপ্রতিমা থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদের মধ্যে 'অশোক' নামের একটি ভারতীয় ট্রলারও আছে, যার মালিক হচ্ছেন অমল দাস। এরপরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার এবং বাংলাদেশে আটক ভারতীয় ট্রলারগুলি ফেরৎ আনার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে পুলিশ-প্রশাসন এদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করায় মৎস্যজীবীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারমেন অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ১৮ ডিসেম্বর থেকে পাথরপ্রতিমার সীতারাম ঘাটে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরা বন্ধ রেখে, জলসীমানায় উপযুক্ত সংখ্যায় বিএসএফ ও উপকূলরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে অবস্থান শুরু করেন। এদের সমর্থনে ৫০০টি ট্রলার রামগঙ্গা ঘাটে নোঙ্গর করে এবং প্রায় ৭ হাজার মৎস্যজীবী অবস্থানে যোগ দেন। এতেও কাজ না হওয়ায় মৎস্যজীবীরা আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। ২৩ ডিসেম্বর বেলা ১১টা থেকে শুরু হয় আমরণ অনশন। ভজহরি দাসের নেতৃত্বে ৪৯ জন মৎস্যজীবী আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্সবার্তা পাঠান এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও তিনি হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান।

২৫ ডিসেম্বর সকালে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কমরেড প্রবোধ পুরকাইত অনশনরত মৎস্যজীবীদের কাছে যান, অবস্থানে বক্তব্য রাখেন। ২৬ ডিসেম্বর সকালে, প্রায় ৭০ ঘন্টা কেটে যাওয়ায় অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটায় দেবপ্রসাদ সরকার সরাসরি মহাকরণে গিয়ে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রধান সচিবের মাধ্যমে লিখিতভাবে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেছে, এই কথা জানিয়ে মৎস্যজীবীদের অনশন প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন। এই চিঠি পাথরপ্রতিমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাসক, ইউনাইটেড ফিসারমেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদারকে চিঠি দিয়ে জানান যে, তিনি ২৮ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে — যার মধ্যে বিএসএফ, নৌসেনা ও উপকূলরক্ষীবাহিনীর কর্তৃপক্ষও রয়েছেন — নিয়ে আলিপুরে বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে সমস্যার প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই মৎস্যজীবীরা টানা ৮১ ঘন্টার পর অনশন প্রত্যাহার করেন।

জেলাশাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর ২৮ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জয়কৃষ্ণ হালদার জানান যে, সুন্দরবন মৎস্যজীবীদের নিয়ে গঠিত কমিটির সাথে ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ, উপকূলরক্ষীবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধি, জেলা পুলিশ সুপার ও মৎস্যজীবীদের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ। কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ৩টি জাহাজ ও তার প্রতিটিতে ৪টি স্পীড বোট ও ১২০ জন জওয়ান সহ স্থায়ী পাহারার ব্যবস্থা আগামী ৩ মাসের মধ্যে করা হবে।

মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকার প্রতিশ্রুতি না রাখলে, মৎস্যজীবীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২১ সংখ্যা ৮

সরকারি কোষাগারের টাকা

সাতের পাতার পর

ষষ্ঠবারের জন্য বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ক্ষমতায় বসেই পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে ভর্তুকি তুলে দিতে শুরু করে বেসরকারি মালিকদের স্বাগত জানানো হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণের ফলে সর্বত্র বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এই পরিষেবাগুলি জনগণকে কিনতে হচ্ছে। পরিষেবা এবং পরিকাঠামো ও উন্নয়ন ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ বন্ধ করে সেগুলিকে শিল্পপতি পুঁজিপতিদের ব্যবসা করার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়মে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক জনসাধারণকে শোষণ করার ফলে পুঁজিবাদ আজ গভীর বাজার সঙ্কটে ভুগছে। কারখানাগুলিতে উৎপাদিত সামগ্রী জমে থাকছে। বিক্রি না হওয়ার ফলে শিল্পগুলি উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। লে-অফ, লক আউট ক্লোজারের ধাক্কায় শিল্পের টালমাটাল অবস্থা। ফলে পুঁজিপতিদের হাতে জমে থাকা পুঁজির বিশাল পাহাড় তারা নতুন শিল্প গড়ে তুলে লগ্নী করার মতো জায়গা পাচ্ছে না। তাই পরিষেবা, পরিকাঠামো গঠন ও উন্নয়নমূলক যেসব ক্ষেত্র সরকারি পরিচালনায় রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে মুনফার জন্য এই পুঁজি ঢুকতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন লাভজনক সরকারি শিল্পের বেসরকারীকরণ করে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে, ঠিক তেমনই এই রাজ্যের বামপন্থী নামধারী সরকারটিও সরকারি এই ক্ষেত্রগুলিকে লুঠেরা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, তাদের জমে থাকা পুঁজির পাহাড়কে খালাস করার রাস্তা করে দিচ্ছে।

তাই পরিকল্পনা-উন্নয়ন-ভর্তুকি খাতে অর্থবরাদ্দ ছাঁটাই করে বামফ্রন্ট সরকার যে আর পাঁচটা জনবিরোধী বুর্জোয়া সরকারের মতো ধুরন্ধর পচে যাওয়া একটি সরকার, মুখে বামপন্থার স্লোগান দিলেও আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থকেই যে রক্ষা করছে তা আজ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

গৃহস্থ ১০০ ইউনিটের বিলের একটি মডেল দেওয়া হল

৭ই নভেম্বর ২০০১ কমিশনের রায়

১০০ ইউনিটের দাম	২২৫.৫০
সরকারি ডিউটি	১৬.৯১
মিটার ভাড়া	৯.০০
মোট	২৫১.৪১

গত জুন (০২) মাস থেকে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বর্তমানে দিতে হয় ২৭৮.৫০

কমিশন ঘোষিত নতুন হার অনুযায়ী দিতে হবে

১০০ ইউনিটের দাম	৩৯০.০০
সরকারি ডিউটি	২৯.২৫
মিটার ভাড়া	৯.০০
মোট	৪২৮.২৫
ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্ত হবে বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ	+ ৫০.০০
ফেব্রুয়ারিতে দিতে হবে	৪৭৮.২৫
এপ্রিলে যোগ হবে বর্ধিত বকেয়া মাশুলের কিস্তি	+ ১৯৫.১২
এপ্রিল থেকে দিতে হবে	**৬৭৩.৩৭**

বিদ্যুৎ মাশুল এখন যা দিচ্ছেন এবং যা দিতে হবে

গৃহস্থ

	এখন দিচ্ছেন	এর পর অতিরিক্ত যোগ হবে	সরকারি ডিউটি ও মিটার ভাড়া ছাড়া মোট দিতে হবে
২৫ ইউনিট	৪০.০০	৫৭.৫০	৯৭.৫০
৬০ ইউনিট	১১৩.৫০	১২০.৫০	২৩৪.০০
১০০ ইউনিট	২২৫.৫০	১৬৪.৫০	৩৯০.০০
১৫০ ইউনিট	৩৮৮.০০	১৯৭.০০	৫৮৫.০০
২০০ ইউনিট	৫৫৫.৫০	২২৪.৫০	৭৮০.০০
৩০০ ইউনিট	৮৯০.৫০	২৭৯.৫০	১১৭০.০০
৩৫০ ইউনিট	১১৪০.৫০	২২৪.৫০	১৩৬৫.০০
৫০০ ইউনিট	১৮৯০.৫০	৫৯.৫০	১৯৫০.০০
	বাণিজ্যিক		
৬০ ইউনিট	১৮০.০০	৫৪.০০	২৩৪.০০
১০০ ইউনিট	৩৩৮.০০	৫২.০০	৩৯০.০০
১৫০ ইউনিট	৫৪৫.৫০	৩৯.৫০	৫৮৫.০০
৩০০ ইউনিট	১২২০.৫০	-৫০.৫০	১১৭০.০০

উপরোক্ত চার্টের সাথে যুক্ত হবে ২.৫ — ১২.৫ পয়সা হারে সরকারি ডিউটি + ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সা হারে বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ এবং এপ্রিল থেকে ৩৪ মাসের বকেয়া মাশুলের একটি অংশ। জুন ০২ থেকে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে যে মাশুল আদায় বর্তমানে চলছে সেই চার্ট দেওয়া হয়নি। ১০০ ইউনিট গ্রাহকের মডেলে, তার পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।

শিল্প গ্রাহকদের বিল কমে যাবে

যে শিল্পগ্রাহক মাসে ৩৫০০ ইউনিট ব্যবহার করবেন, তাঁর বিল ১৮,৮৩৬ টাকা থেকে কমে হবে ১৪,৭২৪ টাকা। কিন্তু আগের ৩৪ মাসের বকেয়াও তিনি ফেরৎ পাবেন পরের ২৪ মাস ধরে। তাই তাঁকে এই দু'বছর মাসে ১০,২৮০ টাকা করে বিল মেটাতে হবে। (সূত্রঃ আনন্দবাজার, ১৯.১২.২০০২)

২৮ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও-র প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতায় সর্বভারতীয় কার্যালয়ের সামনে ছাত্র জমায়েতে বক্তব্য রাখছেন কমরেড চন্ডীদাস ভট্টাচার্য

মালিকদের প্রকৃত শ্রেণীবন্ধু

শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করতে বেশ কিছুদিন যাবত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। অতি সম্প্রতি তিনি বলেছেন, পশ্চিমবাংলার কল-কারখানায় জঙ্গি আন্দোলন বরদাস্ত করা হবেনা। অথচ আজ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সহ ভুখা শ্রমিকদের কোটি কোটি ন্যায্য টাকা মেরে দেওয়ার জন্য, সরকারের কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে এই মুখ্যমন্ত্রীকে একটা নরম কথাও বলতে শোনা যায়নি। অথচ, স্মরণ করুন সেই ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা। তখন শ্রমমন্ত্রী ছিলেন সুবোধ ব্যানার্জী। সংশ্লিষ্ট সকলের মনে থাকার কথা, সেই সময়ে উল্টে সুবোধ ব্যানার্জীর হুমকিতে সন্ত্রস্ত থাকত এ রাজ্যের মালিকরা। শ্রমিক আন্দোলনের তখন এ রাজ্যে প্রবল জোয়ার। তাই দেখা যায় সেই ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে গোটা ভারতবর্ষের যে মালিকশ্রেণী সেদিন একজোট হয়ে মারাত্মক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল, সেই মালিকশ্রেণীই আজ বুদ্ধবাবুর প্রশংসায় পঞ্চ মুখ। কারণ তারা মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে তাদের প্রকৃত শ্রেণীবন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে। অতি সহজ একটি ঘটনার দ্বারাই বোঝা যায়, সি পি এম আজ খোলাখুলি কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলেছে।

মালিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলোর সুরে সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও ক্রমাগত অভিযোগ তুলছেন, আন্দোলনের ফলেই কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কথা শুনে মনে হয়, ডাণ্ডা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ঠাণ্ডা করতে পারলেই এ রাজ্যে শিল্পের জোয়ার বয়ে যাবে। অথচ বাস্তব চিত্রটা কি ? রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন গত ১৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় জানিয়েছেন যে, ২০০১ সালে এ রাজ্যে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে যেখানে ১০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, সেখানে মালিকের লক আউট ও সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের জন্য বন্ধ হয়েছে ৮৭টি কারখানা। এ বছর জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শ্রমিক ধর্মঘটে ১৬টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, আর লক আউট হয়েছে ৭৫টি কারখানায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ২% ও ৯৮%। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ডিসেম্বর, '০২)

তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের ফলেই শিল্পে দুর্গতি বলে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পারিষদরা যে সোরগোল তুলছেন তা ডাহা মিথ্যা নয় কি ? আসলে শিল্প-কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্য কারণে। বন্ধ হওয়ার কারণ নিহিত রয়েছে এদেশের শোষণমূলক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে এই সত্যটাকেই তাঁরা জনগণ থেকে আড়াল করতে চাইছেন। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য যেহেতু মালিকের মুনাফা এবং শ্রমিকের শোষণই সেই মুনাফার উৎস, তাই যত দিন যাবে স্বাভাবিকভাবে ততই কমবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং অবশ্যই কমবে উৎপাদিত পণ্যের বাজার। আর বাজার না থাকলে শিল্পপতিরা কলকারখানায় উৎপাদন কমাবে, নতুবা বন্ধ করে দেবে — নতুন শিল্প স্থাপন তো দূরের কথা। সেই জন্যেই মালিকরা লক আউট, ক্লোজার, সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা করে। বুদ্ধবাবুরা আজ যতই শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখান না কেন, এবং শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করুন না কেন, এই ব্যবস্থায় নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠতে পারে না, সৃষ্টি হতে পারে না কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ। তবে এক দিকে বাইরে থেকে পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন দমন করে এবং অন্যদিকে ভেতর থেকে সুবিধাবাদ-ধান্দাবাজির চর্চা করে আন্দোলনের মানসিকতাকে মেরে দিয়ে মালিকদের অতি মুনাফার পথকে তাঁরা প্রশস্ত করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net